Module No – 1

2nd Semester

Course code – AHBNG – 202C – 1

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ভূতুড়ে ঘড়ি' : প্রসঙ্গ নামকরণ :—

খ্যাতিমান শিল্পীমাত্রেই চান তাঁর শিল্পকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে গড়ে তুলতে, নামকরণের ক্ষেত্রে শিল্পী তাই সচেতন মানসিকতার স্বাক্ষ্য রাখেন, বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের ন্যায় শিল্পের ক্ষেত্রে নামকরণ হয়ে থাকে। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন কিম্বা বোবা মেয়ের নাম সুভাষিণী ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রে হতে পারে কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এধরণের ত্রুটি অমার্জনীয় অপরাধ। নামকরণের সূত্র হয় বিভিন্নার্থক, কখনো ব্যক্তির নামে নামকরণ, কখনো বিশেষ কাহিনী বা ঘটনার উপর নামকরণ আবার কখনো বা ব্যঞ্জনাধর্মীতা নামকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়, আলোচ্য শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ভূতুড়ে ঘড়ি' উপন্যাসটির নামকরণ কতখানি সার্থক হয়েছে তা উপন্যাসটির কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র পর্যালোচনা করে তুলে ধরতে,

আলোচ্য উপন্যাসটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নামকরণ 'ভূতুড়ে ঘড়ি' হলেও উপন্যাসটির কাহিনীতে কোথাও ভূতের দেখা নেই। পাঠক ও নামকরণের দিকে তাকিয়ে সর্বদা অপেক্ষায় থাকে ভূত মহারাজের আবির্ভাব ঘটবে কিন্তু পাঠক চিত্ত সারাক্ষণ পথ চাওয়াতেই আনন্দ পেল একবারও ভূত দেখে অবাক হলো না, সুতরাং উপন্যাসটির নামকরণের সার্থকতা যথাযথ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই একটু দ্বিধার সম্মুখীন হতে হয়, বলতে গেলে উপন্যাসটি প্রতিমুহূর্তে পাঠকের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করে,

~~[illegible] প্রথমে আমরা~~

উপন্যাসটির প্রথমে আমরা দেখতে পাই ঠাকুর বারবার ঘড়ি হারিয়েছে বা চুরি গেছে একবার দুবার নয় তিনশো বাইশ বার, এই ঘড়ি হারানোর পশ্চাতে নিশ্চয়ই

কোনো না কোনো কারণ ছিল, কিন্তু বারবার কেন এমনটি হয় তা কেউ বুঝে উঠতে পারছে না, একবার বাড়ির বড়ো ছেলে তিনশো তেইশ তম আজব ধরনের ঘড়িটি কলকাতা থেকে এনে দিতেই এই ঘড়িকে কেন্দ্র করে যত রকম ভুতুড়ে কাণ্ড কারখানা শুরু হয়। হারানচন্দ্র, বাসবনলিনী, জটাই, মার্টিন প্রত্যেকেই কেমন একটা অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনের বিবরণ করেছে যা আপাত দৃষ্টিতে ভৌতিক বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে তা যে ভৌতিক ব্যাপার নয় উপন্যাসটি যতই এগিয়েছে ততই স্পষ্ট হয়েছে।

ঘড়িটির অদ্ভুত আচরণে সবাই বিস্মিত হতচকিত, আত্মহারা, মার্কোপাহি জ্ঞানহারা কেউ আসল রহস্যের সন্ধান দিতে পারেনি প্রত্যেকেই এটিকে ভৌতিক বলে মেনে নিয়েছেন। পরে উপন্যাসটি যেদিকে মোড় নিয়েছে তাতে ভূত তো দূরের কথা মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন। কেবলমাত্র মানুষ হিসেবে লাটুই ছিল স্বয়ং উপস্থিত, লাটুকে কেন্দ্র করে শুরু হয় ঘ্যাচ ঘ্যাচ ও রামরাহার দ্বন্দ্ব। লাটু তখন ঘড়ি ওরফে র‍্যাডাক্যালিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এমনকি র‍্যাডাক্যালির স্রষ্টা রাম রাহাকে ধ্বংসের জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা প্রায় শেষ পর্যায়ে শুধু সময়ের অপেক্ষা। এইভাবে ঘটনা ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে এগিয়ে চললেও ভূতের জন্য শিহরণকারী অনুভূতি কিন্তু পাঠক চিত্তে আর জমে উঠল না, তবে অজানা একটা রহস্যের হাত-ছানিতে সবাই যে উন্মুখ সেবিষয়ে কোনো সংশয় থাকে না।

উপন্যাসের মধ্যে বিশেষ বিশেষ স্থানে যে ভৌতিক আবেশের সৃষ্টি হয়নি সেকথা বলা যাবে না। ঘড়িটিকে কাছে পেয়ে হারানচন্দ্রের প্রথম প্রতিক্রিয়া যেভাবে ঘটেছে তাতে ভৌতিক বলা যেতে পারে, অন্যভাবে তন্ত্রসাধক জটাই এই ঘড়ির প্রভাবেই তো আত্মাটিকে ল্যান্ডেড করে শেষে জ্ঞানহারা হয়েছেন। মার্টিন সাহেবের মতো বিজ্ঞানীও এই ঘড়ির প্রভাবে সংজ্ঞাহারা হয়েছেন, এমনকি বাসবনলিনীর মতো ঘোর সংসারীও এই ঘড়ির প্রভাবে ও সাংগীতিক মূর্ছনায় আত্মহারা হয়েছেন, এইসব চরিত্রকে কেন্দ্র করে যে যে পরি-বেশের সৃষ্টি হয়েছে সবই তো ভৌতিক পরিবেশের দ্যোতনা এনে দেয়। হয়তো এরা ভ্রমের শিকার হয়েছেন ঘড়িটি সম্পর্কে অজ্ঞতার

কারণে, তবে আশ্চর্যের বিষয় বয়স ও অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা যেভাবে ঘড়ির প্রভাবে সাড়া হারা সেখানে লাট্টুর মতো অল্পবয়স্ক ছেলে কীভাবে ঘুরিতে থাকে? এটাই সবচেয়ে বড়ো অকল্পনীয় ও অভাবনীয়।

আলোচ্য উপন্যাসটিকে যদি "ভুতুড়ে ঘড়ি" নাম না দিয়ে বলা হত "রহস্য ঘড়ি" হয়তো কিছুটা সঠিক হতো, অন্তত উপন্যাসের পরিণতির দিকটি ওই নামকরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হত। কিন্তু স্রষ্টা যখন তার সৃষ্টিকে কোনো নামকরণে ভূষিত করেন তাঁর পশ্চাতে থাকে তাঁর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য, লেখকের এই উপন্যাসটি মূলত শিশু সাহিত্য মূলক, শিশুদের মনে সর্বদা আজগুবি ও ভুতুড়ে বিষয়ে উপভোগ্য করে থাকে। সেদিক থেকে বিচার করে এ নামকরণটি সার্থক, উপন্যাসের অর্ধেকটাই ভৌতিক আর অর্ধেকটা রহস্যঘেরা, সবই শিশু মনের ভালোলাগার বিষয়। উপন্যাসের পরিণতি অংশে যেভাবে লাট্টুর চুলে অঙ্গুলে কাঠি ঘ্যাচ ঘ্যাচ আসল র‍্যাডক্যালিফকে স্পর্শ করে মুহূর্তেই ধ্বংস হয়ে গেল তা রহস্যঘেরা হলেও ভৌতিক বলে মনে হয়।

সর্বোপরি র‍্যাডক্যালিফকে বোল্ড করে লাট্টুর সম্মুখে যেভাবে ঘ্যাচ ঘ্যাচ এবং র [illegible]

রামহরার আবির্ভাব ঘটছে তা ভৌতিকই বলা যেতে পারে। অন্যরা কেউ তাদের উপস্থিতি টের পায়না। পেয়েছে কেবলমাত্র লাটু। বিশেষ চোখ থাকলে তবে অশরীরীদের প্রত্যক্ষ করা সম্ভব, লাটু সেই সৌভাগ্যবান অর্থাৎ ভৌতিক পরিবেশ থেকে উপন্যাসটি ধীরে ধীরে রহস্য আবৃত হয়ে পরিণতি লাভ করেছে। যা শিশু মনকে অবাক করার পক্ষে যথেষ্ট। অবশেষে বলা যায় যে শিশুমনকে আনন্দদানের উদ্দেশ্যে রহস্যের মধ্য দিয়ে পারিপার্শ্বভাবে যে ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, এখানেই উপন্যাসটির নামকরণের সার্থকতা।